মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
রচনাসমগ্র ১

সম্পাদনা : সন্তু বাগ

মন্তাজ

'রামধনু' সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এমএ, বিএল

জন্ম: ২৭ কার্তিক ১৩১০, শুক্রবার

মৃত্যু: ২১ মাঘ ১৩৪৫, শনিবার

সূচিপত্র

জাপানি গোয়েন্দা হুকা-কাশির উপন্যাস ও ছোটোগল্প

পদ্মরাগ ● ১৭
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ● ১০৮
সোনার হরিণ ● ১৬২
শান্তিধামের অশান্তি ● ২৮৭
তেরো নম্বর বাড়ির রহস্য ● ২৯৬
হীরক রহস্য ● ৩০৬
চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য ● ৩১৭
সংসক্তপুরের রহস্য ● ৩২৭

'নূতন পুরাণ' পর্যায়ের গল্প

লঙ্কা-কাণ্ড ● ৩৪১
বিকর্ণ-পর্ব ● ৩৪৯
মঙ্গল-পুরাণ ● ৩৫৭
বৈদ্য-পুরাণ ● ৩৬৭
ঢেঁকিবাহনের কলঙ্ক-ভঞ্জন ● ৩৭৫
ইয়াঙ্কি-পর্ব ● ৩৮৩

নাটিকা

দমাদম-দামোদর ● ৩৯৪

কবিতা

আবোল-তাবোল ● ৪০৯
সাবধানী বুড়ো ● ৪১১
শনিবার! শনিবার!! ● ৪১৩

সবই ভুল ● ৪১৫
বুদ্ধিতে কি না হয়? ● ৪১৮
ভালোবাসি ● ৪২০
বাংলার গান ● ৪২১
নববর্ষ ● ৪২২
রবীন্দ্রনাথ ● ৪২৩
অনাদৃত ● ৪২৪
একটি অপ্রকাশিত কবিতা ● ৪২৬

প্রবন্ধ

বাঙালি পালোয়ান ● ৪২৯
পার্লামেন্টের কথা ● ৪৩৬
লর্ড সিংহ ● ৪৪১
ক্রিকেট-খেলোয়াড় ● ৪৪৭
বাঙালি পালোয়ান ভূপেশচন্দ্র ● ৪৫৩
পালোয়ানের মতো পালোয়ান ● ৪৫৪
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে! ● ৪৫৯
পৃথিবীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ পোল ● ৪৬৩
আগুন! আগুন!! ● ৪৬৯
স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ● ৪৭৫
নেপোলিয়নের আল্পস বিজয় ● ৪৭৮

পরিশিষ্ট

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জীবনপঞ্জী ● ৪৮৫
রামধনু ● ৪৮৮
বইয়ের বিজ্ঞাপন ও আলোচনা ● ৪৯৪

জাপানি গোয়েন্দা

হুকা-কাশির

উপন্যাস ও ছোটোগল্প

হুকা-কাশি

১৯২৮ সাল। ছোটোদের গোয়েন্দা-কাহিনির আদিযুগ চলছে। ক্রিমিন্যাল তত্ত্বের সঙ্গে যৌনতা মিশিয়ে প্রচলিত রগরগে রহস্য রোমাঞ্চের রাস্তা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন মনোরঞ্জন।

কলকাতার ডাফ স্ট্রিট নিবাসী জাপানি হুনুর হুকা-কাশি পোয়ারো-পন্থী। মগজের ধূসর কোশ খাটিয়ে কাজ হাসিল করেন। অকারণে না ফোলান পেশি, না পোষেন পিস্তল। তবে প্রয়োজনে স্বদেশীয় যুযুৎসু-র যুতসই প্যাঁচেও তিনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সক্ষম। খেলোয়াড়-সাকরেদ রণজির মতো আমরাও তাঁর খেল দেখে অবাক মানি।

হুকা-কাশি পর্যায়ের প্রথম রচনা 'পদ্মরাগ'। 'রামধনু' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে তাঁর আবির্ভাব হয় তৃতীয় কিস্তিতে (আশ্বিন ১৩৩৫)। এই সংখ্যায় 'হুকাকাশি' লেখা হলেও, পরবর্তী কিস্তি এবং অন্যান্য কাহিনিতে সাধারণত 'হুকা-কাশি' বানান ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বইতে 'হুকা-কাশি' বানানটিই অনুসৃত হবে।

এই বিচিত্র চরিত্রের জন্মকথা ও নামকরণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মেলে 'রামধনু'-র পাতায়, ননীগোপাল মজুমদার-এর 'আমাদের মনোরঞ্জন' ('রামধনু', বৈশাখ ১৩৪৬) নিবন্ধে। নিবন্ধ থেকে মনে হয় নামটাই প্রথম লেখকের মনে আসে। তার সঙ্গে সংগতি রাখতে গোয়েন্দাকে জাপানি বনে যেতে হয়! প্রসঙ্গত, হুকা-কাশির ভায়রা-ভাই, শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট কল্কে-কাশি কিন্তু জাপান নয়, কোরিয়ার অধিবাসি।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার লিখেছেন, "একদিনের কথা মনে পড়ে। 'রামধনু' অফিসে গিয়ে দেখি, মনোরঞ্জনবাবু মৃদু মৃদু হাসছেন। আমি বললাম, "ব্যাপার কী?" মনোরঞ্জনবাবু বললেন, "তুমি আমাকে কনগ্র্যাচুলেট করতে পার।" আমি বললাম, "কারণ?" "কারণ, আমি এমন একটি চরিত্রের কল্পনা করেছি, যাতে বাংলা-সাহিত্যে একটা নতুন জিনিসের আবির্ভাব হবে।" "যথা?" "হুকা-কাশি।" বলে তাঁর প্রচণ্ড হাসি। আমি তো অবাক! ওই অদ্ভুত নামটির অর্থ কী? হাসতে হাসতে বললেন, "হুকা খেলে কি হয়? কাশি তো? এ দুয়ে মিলিয়ে হল আমার ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়কের নাম। অবশ্য এই অদ্ভুত নামটির জন্য ভদ্রলোককে জাপানি বানাতে হল। তবে তাঁর সাকরেদটি full-blooded বাঙালি, আর তার নাম হল রণজিৎ—অর্থাৎ বুদ্ধির যুদ্ধে জিত অনিবার্য।" এতক্ষণে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হল। তাঁর স্বভাবসুলভ রস তিনি নীরস গোয়েন্দার নামেতে ঢেলেছেন। অদ্ভুত!

সেদিন তিনি ঠাট্টাচ্ছলে যা বলেছিলেন, দু'দিন বাদেই দেখা গেল তা কত বড়ো সত্যি!

সত্যিই তাঁর 'হুকা-কাশি' বাংলা শিশু-সাহিত্যে একেবারে নতুন জিনিস আমদানি করল। হুকা-কাশিকে নিয়ে বেশি গল্প তিনি লিখে যেতে পারেননি, কিন্তু যা লিখেছেন তাতেই তাঁর নাম শিশু-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।"

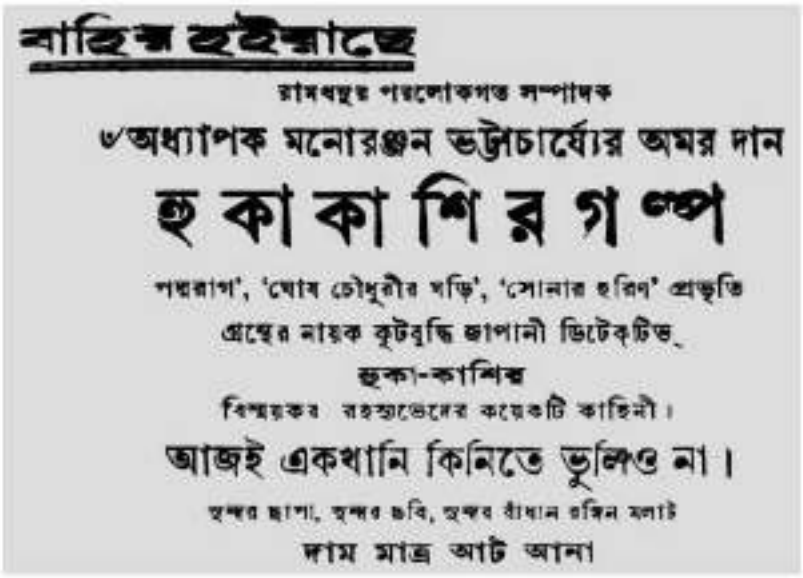

লেখকের মৃত্যুর পর বেরয় ছোটোগল্পের সংকলন 'হুকা-কাশির গল্প' (১৩৪৮)।

বিভাস চক্রবর্তী নির্মিত দূরদর্শন ধারাবাহিকে হুকা-কাশির ভূমিকায় রমাপ্রসাদ বণিক (১৯৯৩)। গল্প : 'তেরো নম্বর বাড়ির রহস্য'।

তথ্যসূত্র : 'রামধনু' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা এবং সৌরভ দত্ত, 'মনোরঞ্জন মিউজিয়াম' ব্লগ

পদ্মরাগ

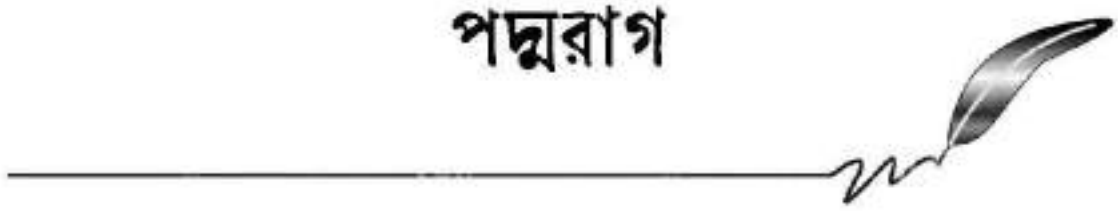

১

গুন্ডার কবলে

রাত তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ঢাকা শহরের বড়ো রাস্তার উপর, বেশ সাজানো গোছানো একখানা দোতলা বাড়ির সামনে রণজিতের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। কোন রণজিতের কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছ। সমসেরপুরের রণজিতের নামটা কি আর শোন নাই? সারা বাংলা দেশটায় খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার-কসরত প্রভৃতিতে অত বড়ো ওস্তাদ আর কে আছে? বয়স তার সবে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর, কিন্তু এর মধ্যেই গোটা দেশময় সে বেশ একটু নাম করিয়া লইয়াছে। বড়োলোকের ছেলে, টাকাপয়সার অভাব নাই, লেখাপড়াটাও ভালো মতোই শিখিয়াছে, গায়ে অসুরের মতো জোর, দিব্যি স্বাস্থ্য, সব দিক দিয়াই চমৎকার। ভারী মনের ফুর্তিতে আছে সে।

ঢাকায় আসিয়াছে রণজিৎ তার দিদির বাড়িতে বেড়াইতে। অনেকদিন দিদির সঙ্গে দেখা হয় নাই, তার উপর আবার দিদির ছেলেপিলেদের না দেখিয়া রণজিৎ বেশি দিন থাকিতেও পারে না—বড়ো মন কেমন কেমন করে।

আসিবার আগে কোনো খবর দেওয়া ছিল না, কাজেই রণজিতের দিদি সুপ্রভা কোনো খবরই রাখিতেন না। বাড়ির খাওয়াদাওয়ার পাট তখন চুকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ রণজিৎকে দেখিয়া দিদি আহ্লাদে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রেই হাঁকডাক করিয়া চাকর-বাকরদের উঠাইয়া, লুচি ভাজিয়া, ডালনা রাঁধিয়া, রাবড়ি আনাইয়া একেবারে একটা রাজসূয় ব্যাপার বাধাইয়া তুলিলেন। বাড়ির কর্তা, অর্থাৎ কিনা রণজিতের ভগিনীপতি বিনোদবাবু, তখন খাটের উপর কাত হইয়া পড়িয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে দারুণ নাক ডাকাইতেছিলেন। ভদ্রলোক আজ মনে বড়ো কষ্ট পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, রাত্রের খাওয়াটা তাঁর আজ মোটেই জমে নাই। মাছ গিয়াছিল বিড়ালে খাইয়া, আর দুধ গিয়াছিল নষ্ট হইয়া। কাজেই মনে কষ্ট হওয়ার তো কথাই! লুচির মিষ্টি গন্ধ নাকের ভিতর ঢুকিতেই তিনি জাগিয়া উঠিয়া একেবারে বিছানার উপর সোজা হইয়া বসিলেন। প্রথমটা ভাবিয়াছিলেন বাড়ির সকলে বুঝি তাঁকে দুটি ডাল ভাত খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া, নিজেদের জন্য ফলারের জোগাড় করিতেছে; কিন্তু রণজিৎকে দেখিয়া বুঝিলেন, না, তিনিই ভুল

সোনার হরিণ

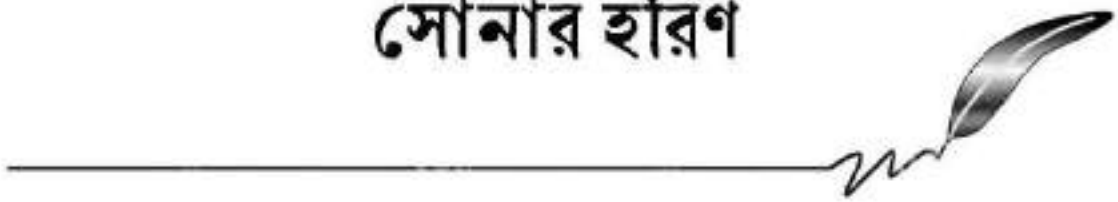

১
দু'খানা চিঠি

কলিকাতার কিছু দূরে গঙ্গার উপর একখানি গণ্ডগ্রাম, নাম শ্রীপুর। গ্রামখানাকে কেন্দ্র করিয়া রেলওয়ে কোম্পানি নানা দিকে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দিয়াছে, স্টিমার কোম্পানিও অনেক পয়সা খরচ করিয়া সেখানে একটা পোক্ত রকমের আড্ডা গাড়িয়াছে। এত আড়ম্বরের কারণ বড়ো দরের ব্যাবসা-বাণিজ্যের জায়গা বলিয়া শ্রীপুরের বেশ খ্যাতি আছে।

অনেক ধনী ব্যবসায়ীর বাস এই শ্রীপুর গ্রামে। এই ধনীদের মধ্যেই আবার 'ধনকুবের' বলিয়া যিনি পরিচিত তাঁর নাম দ্বারকানাথ বসু। শ্রীপুরের প্রকাণ্ড চিনির কলের তিনিই মালিক, তা ছাড়া বাংলা দেশের বহু জায়গায় বহু কারবারে তাঁর অজস্র টাকা খাটিতেছে। দ্বারকানাথের ধনদৌলত ও-অঞ্চলে প্রবাদ বাক্যের মতো।

গঙ্গার উপর অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া নানারকম ফল-ফুলের বাগান, পুকুর, আর তারই মাঝখানে দ্বারকানাথের বিরাট অট্টালিকা। এই অট্টালিকারই নদীর দিককার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রৌঢ় দ্বারকানাথ শূন্য মনে জেলেদের মাছ ধরা দেখিতেছিলেন। প্রথম জীবনে বড়ো বেশি পরিশ্রম করার ফলে এরই মধ্যে তাঁর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, নিত্যিনতুন অসুখ দেখা দিতেছে। ডাক্তারদের তাই নির্দেশ, তিনি যতদূর সম্ভব মানসিক পরিশ্রম, লেখাপড়া প্রভৃতি কমাইয়া গঙ্গার মুক্ত বাতাস সেবন করিবেন।

এই বয়সেও দ্বারকানাথের গায়ের রং চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল। কপালটা এতখানি চওড়া যে সচরাচর সেরকম চোখে পড়ে না। মুখে কিন্তু তাঁর কোমলতার আভাস বড়ো বেশি নাই, বরং একটা কঠোর-পরুষভাব। পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়া দুই চোখের রুক্ষ দৃষ্টি যেন মানুষের অন্তর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়।

যে বারান্দাটির উপর ইজিচেয়ারে দেহভার এলাইয়া দিয়া দ্বারকানাথ গঙ্গার শীতল বাতাস উপভোগ করিতেছিলেন, তারই অপর দিকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। তার উপর নজর পড়িতেই দ্বারকানাথ বলিলেন, "ওহে সলিল, অহিভূষণের খবর জানো?"

লঙ্কা-কাণ্ড

লঙ্কাপুরীতে মহা হইচই পড়িয়া গেছে।

ভোর হইতে বেহারি রাক্ষসেরা শহরময় খবরের কাগজ ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে—'এই ভীষোণ কাণ্ডো হোয়ে গেলো বাবু, নন্দনবাগান মে ভীষোণ কাণ্ডো হোলো—কাঁচালঙ্কা পত্রিকা—আজকের কাঁচালঙ্কা পত্রিকা!' পত্রিকাখানা লঙ্কা নগরের কাঁচা, অর্থাৎ অল্প বয়সের রাক্ষসেরা বাহির করে, কাজেই তার নাম 'কাঁচালঙ্কা পত্রিকা'।

চিত্র ১: কাঁচালঙ্কা পত্রিকা!

ব্যাপারটা অসাধারণই বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাল রাত্রেই রেডিয়োতে সে খবর লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিয়া গেছে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল—এই তিন মহাদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে টেনিস কম্পিটিশন হয়, এতদিন ধরিয়া তার সেরা খেলোয়াড় বা চ্যাম্পিয়ান হইয়া আসিতেছিলেন ইন্দ্র। এবার সে জাঁক তাঁর ভাঙিয়াছে—লঙ্কার কুমার মেঘনাদ ফাইনালে তাঁকে পর পর তিনটি 'লাভ' সেট দিয়া ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ানশিপ

বিকর্ণ-পর্ব

শীতের শেষ হইয়া আসিয়াছে, সামনেই বসন্তকাল। এখনও অবশ্য বসন্ত ভালোভাবে দেখা দেয় নাই, কেবল 'হেভেনওয়ার্ড' পত্রিকা খবর দিয়াছেন সুদূর কলিকাতার কোনো অঞ্চলে নাকি দু'চারটা 'কেস' দেখা গেছে। তাও আবার আসল বসন্ত বা স্মল পক্স নয়, জলবসন্ত। ফাল্গুন এবং চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল—কলিকাতার সমস্ত লোক টিকা লইয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এই সময়টা কাটাইয়া দেয়।

শকুনি মামি নিজে দাঁড়াইয়া দাসী-চাকরানিদের দিয়া শাল-দোশালা প্রভৃতি গরম কাপড়গুলি গুছাইতেছিলেন। শীত চলিয়া গেছে, তাই এগুলিকে ধোয়াইবার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইতে হইবে। আমেরিকার ফোর্ড সাহেবের মতো নিতান্ত গরিব যারা তারাই কেবল এখন নিজেদের দেশে কাপড়-চোপড় ধোয়ায়; বড়োলোকেরা ময়লা কাপড়ের বোঁচকা ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেয়।

চিত্র ১: শকুনি মামা-মামি

বৈদ্য-পুরাণ

স্বর্গের রাজধানী অমরাবতী শহরের ডক্টর লেনে বিশেষ গুরুতর এক পরামর্শ-সভা বসিয়াছে। আলোচনার বিষয়টা ভারী গোপনীয়, তাই বাহিরের কোনো লোক যাহাতে ভিতরে ঢুকিতে না পায় তাহার জন্য বেজায় কড়াকড়ি রকমের ব্যবস্থা হইয়াছে। এমনকি, খবরের কাগজের সংবাদদাতারা পর্যন্ত দারোয়ানের ভুঁড়ি এড়াইয়া ভিতরে যাইতে পারেন নাই।

চিত্র ১: বেজায় কড়াকড়ি রকমের ব্যবস্থা।

বহু, বহুদিন পূর্বে দেবতা এবং অসুরে মিলিয়া যখন সমুদ্রমন্থনের কথা ওঠে তখন ডাক্তার অশ্বিনীকুমারের দুই ভাই ভারী জোর গলায় সায় দিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, মন্থনের সময় বাসুকীর লেজ ধরিয়া তাঁরা টানিয়াও ছিলেন উৎসাহে। দু'দিন বাদেই কিন্তু ডাক্তারভাইরা বুঝিলেন, তাঁরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারিয়াছেন। সমুদ্রমন্থনে একহাঁড়ি অমৃত উঠিল; দেবতারা বুদ্ধিমান জাত, অসুরদের মাথায় হাত বুলাইয়া অমৃতের হাঁড়িটা গাপ করিলেন। তার পরের কথা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নয়। কয়েক ঢোক